কষ্ট নেবে কষ্ট, অনেক রকম কষ্ট

হিফজুর রহমান

গুলেনবারি সিনড্রোমের পঙ্গুত্ব কাটিয়ে উঠতে পারিনি এমনই সময় ধরে বসলো জন্ডিস, যাকে চিকিৎসকরা বলেন ভাইরাল হেপাটাইটিস। ফলাফল, গত প্রায় আড়াই সপ্তাহ হাসপাতাল ও বাসা মিলিয়ে শয্যাশায়ী। এখন বাসায়ই চিকিৎসা চলছে। নার্স স্যালাইন দেয়ার জন্যে ক্যানোলা ঢোকাতে গিয়ে ভেইন খুঁজে পাননা প্রায়শঃই। বিছানায় চিৎপাত শুয়ে বই পড়া আর টিভি দেখা ছাড়া কোন কাজ নেই, বা চিকিৎসকের কথামতো আপাততঃ এটাই আমার একমাত্র কাজ। অর্থ্যাৎ প্রায় পাঁচ মাস কাজের বাইরে। এই হলো বর্তমান অবস্থা আমার। কিন্তু, এই লেখাটাও অত্যন্ত জরুরী ছিল অনেক দিন ধরেই। অসুস্থতার কারণে বিরত থেকেছি। স্টাডিতে যাবার শক্তি নেই, ক্ষমতাও নেই। তাই বিছানায় বসে কোলের ওপর ল্যাপটপটা নিয়ে এই লেখাটি লিখে ফেলার চেষ্টা। এই লেখায় কারো কারো প্রতি আমার ব্যক্তিগত বিরাগের প্রকাশ ঘটে যেতে পারে। সেটাকে অবস্থা এবং আমার মানসিক অবস্থান বুঝে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেই খুশী হবো। আর ক্ষমা না করলেও আমার কিছু যায় আসেনা। কারণ, দূরাচারদের ক্ষমার ওপর কোনদিন ভরসা করিনি, এখনও ভরসা করিনা।

যে কারণে এই লেখা

আমি জন্ডিসে মাত্র আক্রান্ত হয়েছি, সেও প্রায় আড়াই সপ্তাহ আগের কথা। রাতে বসে টিভি দেখছিলাম। হঠাৎ মোবাইলে আননোন নাম্বার থেকে ফোন। ধরতেই বারীর (জনকণ্ঠের ফজলুল বারী) কণ্ঠ। বারী আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ এবং সাংবাদিক। একসাথে একটি জাতীয় দৈনিকে কাজও করেছিলাম, যেখানে আমি বার্তা সম্পাদক ছিলাম, বারী ছিল স্টাফ রিপোর্টার। সাংবাদিকতায় তার আত্মনিবেদনের কারণেই বয়েসে ছোট হলেও তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। বেশ কিছুদিন ধরেই ও অস্ট্রেলিয়ায় আছে এবং ভুল শুদ্ধ মিলিয়ে অবিরাম অস্ট্রেলিয়ার কথা লিখে যাচ্ছে জনকণ্ঠে। সেই বারী বলে উঠলো অনেকটা অনুযোগের সূরেই, "হিফজুর ভাই, আপনি বনি আমিনের কর্নফুলীতে লেখেন? এইটা নিয়েতো সমস্যা হচ্ছে এখানে। অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি স্বাধীনতা বা মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী লোক কি না? আমি ওদের বলেছি, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধকেই ধারণ করে বসে আছেন এখনো।" মোট কথা বনি'র কর্নফুলিতে লেখার কারণে সিডনীতে আমি নাকি প্রায় অস্পৃশ্যতে পরিণত হয়েছি। বারী আরেকজনকে টেলিফোনে ধরিয়ে দিল। তার নামটা ঠিকমতো শুনতে পারিনি। সে আমার প্রশংসা করলো অনেক, বেহুদা। তারও মত হলো সিডনীতে অনেক প্রগতিবাদী অনলাইন ম্যাগাজিন আছে, সেগুলোতেওতো আমি লিখতে পারতাম। আমি বললাম, এখন কাউকে সেধে লেখা দেবার বয়সও নেই, ইচ্ছাও নেই। তাছাড়া তারা কেউ কোনদিন আমার সাথে যোগাযোগও করেনি। আর বনি প্রায় জোর করেই ওর ম্যাগাজিনে আমাকে লিখতে বাধ্য করে। তাই আমি ওখানেই লিখছি। তাওতো শারিরীক কারণে গত পাঁচ মাস প্রায় লেখাই হয়না।

ওদের কথার সারবাক্যগুলো সম্ভবতঃ ছিল এইরকম যে, বনি প্রগতি বিরোধী, স্বাধীনতা বিরোধী এবং ধর্মীয় মৌলবাদী। এই কারণে, সিডনীতে আকিদুল ইসলাম, অজয় দাশগুপ্ত, বিরূপাক্ষ পালদের মতো বিদগ্ধ জনেরা ওর দিকে ফিরেও তাকায়না। তাছাড়া বনি সবার সাথে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করে এবং তার কর্নফুলীতে তাদের বিরুদ্ধে যা নয় তাই লিখে থাকে। সুতরাং এখন আমার উচিত হবে বনিকে এবং কর্নফুলীকে এড়িয়ে চলা। ওদের কথার জবাব দিতে পারিনি লাইন কেটে যাওয়ায়। তারপরতো আমি হাসপাতালে। তখন থেকেই ভাবছিলাম, এই লেখাটা লিখতেই হবে এবং কর্নফুলীতে। অবশ্য বনি যদি না ছাপে সেটা অন্য কথা।

বনির কথা

প্রথমে বনির কথাই বলি। আরজ আলী মাতুব্বর পড়া বনি ধর্মীয় মৌলবাদি হবে এটা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে কঠিন। তাছাড়া আমি ওর জীবনাচরণ সম্পর্কে যতোটুকু জানি তাতে কোন প্রকার ধর্মান্ধতার ছায়া আছে বলেও আমি বিশ্বাস করিনা। আর ওর পেশা যা ছিল তাতে আমার সাথেই তো পেশাগত বিরোধ ছিল চরম। সুতরাং সিডনীর অনেকের সাথে তার বিরোধ থাকবে তাতে আমি অবাক হইনা। আমি তখন অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের পলিটিকাল/ইকনমিক অফিসার। ওই সময় রিফিউজিদের কেস আমারই ঘাড়ে এসে পড়তো। তখন রেজা আরেফিন নামক এক সাংবাদিক (আজকের কাগজের তদানীন্তন বার্তা সম্পাদক) ভেগে গেলেন অস্ট্রেলিয়ায় এবং যথারীতি প্রটেকশন ভিসা চাইলেন। তার রিপোর্ট আমাকেই দিতে হয়েছিল এবং সেজন্যে তিনি (রেজা আরেফিন) আমাকে সম্ভবতঃ মৃত্যুদন্ডও দিয়েছিলেন। তার পক্ষে সেটা সম্ভবও ছিল। কারণ ঠিকাদারি করতে করতে আরেফিন হঠাৎ কর্নেল শাহেদের হেঞ্চম্যান হিসেবে আজকের কাগজের বার্তা সম্পাদক বনে যায়। বর্তমানের প্রথিতযশা সাংবাদিক মতিউর রহমান চৌধুরীকে শায়েস্তা করার জন্যেই নাকি রেজা আরেফিন সাংবাদিক হয়ে উঠেছিলেন। তার কেসটা নিয়েই বনি ঢাকা এসেছিল, আজকের কাগজের সম্পাদক কর্নেল (অবঃ) শাহেদের ভিডিও ইন্টারভিউ করে আমার বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণ করার জন্যে। তখন আমার অফিসে এসে একটা ছোটখাট হুমকিও দিয়েছিল এই বলে যে, এই কেসটা নিয়ে আমার বিপদ হবে। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কোন বিপদ এখনো আমার হয়নি। বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কাজী জাফর আহমেদের কেস নিয়েও বনির সাথে তুমুল বিরোধ হয়েছিল আমার। এরকম আরো অনেক কেস নিয়ে। ২০০১ সালের ডিসেম্বরে অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের চাকুরী ছাড়ার আগ পর্যন্ত এমনই ছিল বনি আমিনের সাথে আমার সম্পর্ক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিডনীর আরেক বিখ্যাত সলিসিটরও আমার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। অনেকদিন সুবিধা না করতে পারলেও সে অস্ট্রেলিয়ার "গে" সমাজের নেতা হিসেবে একটা সুযোগ পেয়ে গেল শেষপর্যন্ত। আমার শেষ হাই কমিশনার রবার্ট ফ্লিন ছিল একজন গে। এই ফ্লিন-এর সাহায্য নিয়ে উক্ত সলিসিটর আমাকে দুর্নীতিবাজ প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছিল। আমি যখন দেখলাম জলে বাস করে কুমীরের সাথে বিবাদ করা যাবেনা, তখনই চাকুরীটা ছেড়ে দিলাম। তবে ডিভাইন জাস্টিসের খড়গ নেমে এসেছিল ফ্লিনের ওপরও। চাকুরী হারিয়ে তিনি এখন নাকি বাংলাদেশের ক্রিকেটার বুলবুলের সাথে ব্যবসা করছেন। যাই হোক, পরম করুণাময় তাদের সবার মঙ্গল করুন।

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ও ধর্মান্ধ বনি আমিন

প্রগতির চরিত্র এবং মানবিক সম্পর্ক বনাম স্বার্থের সম্পর্ক

বিরূপাক্ষ পালঃ বিখ্যাত লেখক, বিতার্কিক ও অতি বিদগ্ধজন বিরূপাক্ষ পালও আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ (ছিলেন)। মাইডাসের সাথে ১৯৯৪ সালে সম্ভবতঃ বিশ্বব্যাংকের একটি গ্রন্থ সম্পাদনার কাজ করার সুবাদে তার স্ত্রী পারভিন বা ইথারের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল। তখন জানতামনা বিরূপাক্ষ তার জীবনসঙ্গী। ইথার অস্ট্রেলিয়ায় মাইগ্রেশনের জন্যে আবেদন করলো। তাতে আমার কোন ভূমিকা ছিলনা। তবে বিপদে পড়ে গেল সে তার সন্তানদের বা সন্তানের অভিভাবকত্ব (চাইল্ড কাষ্টোডি) নিয়ে কি এক জটিলতায়। সেটার কারণে তার হয়ে যাওয়া মাইগ্রেশনও ভেস্তে যায় প্রায়। ইথার আমার অফিসে এসে কথাটা জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেললো। আমি অভয় দিয়ে আমার ব্যক্তিগত প্রভাব কিছুটা খাটালাম ব্যাংককস্থ ইমিগ্রেশন অফিসার আইরিনের ওপর। আইরিন আমাকে বিশ্বাস করতো যথেষ্ঠ। ও শুধু বললো,

তুমি যা বলছো সেটা লিখে ফ্যাক্সে পাঠাও বাংককে। তারপর আরো একটু টানা হেঁচড়ার পর ওদের মাইগ্রেশন হয়ে গেল। ওরাও আমার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে গেল খুব দ্রুতই। এরই মধ্যে ইথারের মাধ্যমে বিরূপাক্ষের লেখা গ্রন্থ উপহার পেলাম এবং তার পান্ডিত্য দেখে মুগ্ধও হলাম। ওরা অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করার আগে সেই কৃতজ্ঞতাবশতঃই সম্ভবতঃ ধানমন্ডি সাতাশ নম্বর রোডের গুরমে গার্ডেন রেস্তোরাঁয় আমাকে সপরিবারে নেমন্তন্নও করেছিল। অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে থাকাকালে অস্ট্রেলিয়ায় যতোবার গেছি অন্ততঃ এক বেলার জন্যে হলেও বিরূপাক্ষদের আন্তরিক আতিথ্য গ্রহন করতেই হয়েছে। কিন্তু, অস্ট্রেলীয় দূতাবাস ছাড়ার পর অর্থ্যাৎ ২০০১ সাল থেকে আজো পর্যন্ত বিরূপাক্ষ পালরা সম্ভবতঃ আমার কথা একবারো মনে করতে পারেনি। বোধহয় প্রগতির চরিত্র এমনই নির্মম যে, প্রয়োজন না থাকলে তার সাথে আর যোগাযোগও করতে হবেনা। তবুও বিধাতা তাদের মঙ্গল করুন।

অজয় দাশগুপ্তঃ বিরূপাক্ষ এবং আমার চাটগাঁর কিছু কবি বন্ধুর মাধ্যমে অজয়ের সাথে পরিচয় আমার। ছোটখাটো কাজে প্রায়শঃই তার সাথে যোগাযোগ হতো আমার সেই অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে থাকতেই। তার সম্পর্কে বিশদ বলবোনা। তবে, শেষবার ২০০১-২০০২ সালে যখন অস্ট্রেলিয়া গেলাম, তখন নিজে থেকেই ফোন করে অজয় ও বিরূপাক্ষের সাথে যোগাযোগ করে ছিলাম ওদের প্রতি আমার ভালো লাগার কারণেই। অজয় আমাকে ও বিরূপাক্ষ পরিবারকে নেমন্তন্ন করেছিল ওর বাসায় মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে। ম্যারিকভিল থেকে প্রায় একঘন্টা ট্রেনভ্রমন করে ওদের ওখানে গিয়েছিলাম। ওরা তখন জানতোনা, আমি অস্ট্রেলীয় দূতাবাস ছেড়ে দিয়েছি। অজয় অনেক খাওয়ানোর পর একটা দামি উপহারও দিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কোন এক আত্মিয়ের অস্ট্রেলীয় দূতাবাস বা ভিসা সংক্রান্ত একটা সমস্যাও জুড়ে দিয়েছিল। আমি কিছুটা বিড়ম্বনায় পড়েই আর ওদেরকে বলতে পারিনি আমার অস্ট্রেলীয় দূতাবাস থেকে ডিপারচারের কথা। পরে অজয় ফোনে আমার কাছ থেকে জানলো, আমি তাকে সাহায্য করার মতো অবস্থায় নেই। সেই অজয়ের সাথে আমার সম্পর্কের শেষ। সেও বোধহয় এই ক'বছরে আমাকে ভুলে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিধাতা তারও মঙ্গল করুন।

প্রগতিবাদী, স্বাধিনতার সপক্ষশক্তি ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূর্তপ্রতীক অজয় দাশগুপ্ত

সুব্রত কিংকর মজুমদার (বাপ্পি)ঃ মাস কয়েক আগে বনি ফোন করে জিজ্ঞেস করলো, বাবুল ভাই (আমার ডাক নাম, জানিনা আর কেউ জানে কি না) বাপ্পি মজুমদারকে চেনেন? আমি বললাম, কোন বাপ্পি? বনির জবাব, কেন আপনাদের রাজশাহীতেই বাড়ি। আপনাকেতো চেনে। আমি খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বললাম, ওকে বলে দাও, ও একটা নিমকহারাম। বনিও সম্ভবতঃ বিনা দ্বিধায়ই বলে দিয়েছিল বাপ্পিকে সেকথা। কেন বললাম, সেকথায় আসি। বাপ্পির বাড়ি আর আমার বাড়ি রাজশাহীতে খুব কাছাকাছি। ওর বাবা প্রয়াত সারদা কিংকর মজুমদার রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে আমার অতি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ছিলেন। ওর বড়বোন কবিতা আমার কলেজ জীবনের বন্ধু। মোট কথা ওদের গোটা পরিবারের সাথেই আমাদের পরিবারের একটা গভীর সখ্য ছিল। বাপ্পির তিন ভাই একসময় মস্কোতে ছিল। আমি সেখানেও তাদের কাছে গেছি। অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে যোগ দিয়ে আমি যখন আরেকটু জাতে উঠলাম, ওই সখ্যতা আরো বাড়লো। ওদের ঢাকার বাসায় এমন কোন অনুষ্ঠান হতোনা যেটা আমার উপস্থিতি ছাড়া হতো। বাপ্পি চাকুরী করতো জিওলজিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশে। তখন সম্ভবতঃ ডেপুটি ডিরেক্টর ছিল। আমি ওকে একদিন বললাম দেশে পড়ে থেকে জীবনটা নষ্ট করছো কেন? তার চেয়ে বরং অস্ট্রেলিয়া চলে যাও। কিছুটা গাঁই-গুঁই করে শেষপর্যন্ত ও আবেদন করলো ইমিগ্রেশনের জন্যে। সম্ভবতঃ ফর্মটাও আমি কিনে

এনে দিয়েছিলাম। ওই সময় ইমিগ্রেশন পাবার বিষয়টা বেশ সহজই ছিল। ছয়মাসের মধ্যেই ওর পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ভিসার স্টিকার ব্যাংকক থেকে ঢাকা এসে গেল। তখনই বাধলো বিপত্তি। কারণ, তখন বাপ্পি ছিল আমেরিকায়, একটা প্রশিক্ষনে। এদিকে একমাসের মধ্যে ভিসা লাগাতে হবে পাসপোর্টে, আর পাসপোর্ট বাপ্পির সঙ্গে আমেরিকায়। তারপর বাপ্পির বড়োভাই ববি কিভাবে আরেকটা পাসপোর্ট বানালো, আমি কিভাবে বাপ্পির অবর্তমানে ওই পাসপোর্টে ভিসা লাগালাম তার ইতি বৃত্তান্তে আর নাই বা গেলাম। কারণ, তাতে সবাই জেনে যাবেন, যাদের আমি আপন মনে করতাম তাদের জন্যে কিইবা না করতে পারতাম, কোন ব্যক্তিস্বার্থ চিন্তা না করেই। বাপ্পি যুক্তরাষ্ট্র থেকে ছুটি নিয়ে এলো এবং চলে গেল অস্ট্রেলিয়ায়। যাবার বেলা ভয় পাচ্ছিল যে বিমানবন্দর ইমিগ্রেশনে ধরা না পড়ে যায়! কারণ, ওর এইভাবে যাওয়াটা বাংলাদেশ সরকারের কাছে ছিল একদম বেআইনি। ওর সেই ভয়ও দূর করলাম। বিমান বন্দরে গেলাম এবং কোন ঝামেলা ছাড়াই একেবারে বিমানে চড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থাও করলাম। বাপ্পিও খুব কৃতজ্ঞ হয়ে গেল। বাপ্পি বিয়ে করলো। ওর স্ত্রীও চলে গেল। তারপর থেকে অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে যদ্দিন ছিলাম বাপ্পি ঢাকায় এলে আমার সাথে দেখা না করে যেতোনা। আর অস্ট্রেলিয়ায় আমি গেলে ওকে আমার সঙ্গ একবেলার জন্যে হলেও দিতে হতো। তখন ওর কথায় মনে হতো ওর বাবা-মা ভাই-বোনের পরই আমার স্থান। দেখা হলেই পা ছুঁয়ে সালাম করতো। সেই বাপ্পিই গত ছয় বছরে আমার খোঁজ একটি বারের জন্যেও নেয়নি। যেমনটা নেয়নি ওর ঢাকার পরিবারের কোন সদস্যও। তাদের জীবন থেকে হিফজুর রহমান নামটাই যেন উবে গেছে। তারপরও বিধাতা তাদের সবারই মঙ্গল করুন।

আবারও বনির কথা

আগেই বলেছি, অস্ট্রেলীয় দূতাবাসে চাকুরী করা কালে বনির সাথে আমার সম্পর্ক ছিল প্রায় অহি-নকুল সম্পর্কের মতো। অথচ অস্ট্রেলীয় দূতাবাস ছাড়ার পর আমাকে অবাক করে দিয়েই বনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ডার্লিং হারবারের একটি দামি রেস্তোরাঁয় তিনশ ডলারের লাঞ্চ খাওয়ানো থেকে শুরু করে আমার অসুস্থতার সময় দেখাশোনা করা ছিল বনি আর বনির স্ত্রী লিটুর নিত্যকর্ম। সেই সম্পর্ক আজো অম্ল-মাধুর্যের মধ্যেও বেঁচে আছে কেবল বনিরই গুনে। নিয়মিত ফোন করে ঘন্টার পর ঘন্টা সে কথা বলে। মেইল করে। সবার ওপর জোর করে লেখায়। মাঝে মধ্যে মনে হয়, বনি কেন এমন করে? অন্ততঃ এই আমির কাছ থেকেতো ওর কিছুই পাবার নেই। আমার অর্থ-সম্পদও নেই যে গুনে মানুষ সম্পর্ক বজায় রাখতে আকৃষ্ট হবে। এখন এই বনি সম্পর্কে আমি কি বলবো? প্রগতিবাদীদের কথা শুনবো না আমার হৃদয়ের কথা শুনবো?

আমার কথা

অন্যের সমালোচনা করার কোন যোগ্যতাই আমার নেই। কারণ, অনেক দোষে, অনেক অপরাধে ক্লিষ্ট, ক্লিন্ন আমি নিজেই। তারপরও বারীর উস্কানিতে এই কিছু তিক্ত কথা লিখেই ফেললাম। তাতে কারো মনে কষ্ট পৌঁছুলে আমার কিছু করার নেই। তবে এইবারের মতো অসুস্থতা থেকে বেঁচে গেলে "মনুষ্য দর্শন" শীর্ষক একটি ধারাবাহিক লেখার ইচ্ছা রইলো কর্নফুলীতে। বাঁচার কথা এই জন্যে বললাম যে, ৩৪ বিলিরুবিন নিয়ে জন্ডিস থেকে ক'জন বাঁচে জানিনা। শুধু বারীর জন্যে বলছি, একসময় যে হিফজুর রহমান বিধাতার আশির্বাদে অনেক মানুষের বাঁচার পথ করে দিয়েছিল, অনেক মানুষের স্বস্তির কারণ হয়ে ছিল, সেই হিফজুর রহমানের যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছেনা কেবল অর্থাভাবেই। এক সপ্তাহ আগে হাসপাতাল ছেড়ে বাসায়ও চলে এসেছি সেই কারণেই। বারীর উদ্দেশে কেন লিখলাম? কারণ, বারী আমার সেসব ইতিহাসের অনেকখানিই জানে। তারপরও মাথা নোয়াচ্ছিনা। প্রায় একাই লড়ে যাচ্ছি নিষ্ঠুর জীবনের সাথে, সঙ্গে অবশ্য আমার স্ত্রী-কন্যা আছে, আছে ঢাকার কিছু আত্মজন। বয়স তেপ্পান্নয় সম্ভবতঃ জীবনের এই শেষ লড়াইয়েও জিতে যাবো, যেমনটা জিতেছিলাম মুক্তিযুদ্ধের সময়। আমরা তো ফিনিক্স পাখীর মতো

ধ্বংসস্তুপ থেকে জেগে উঠি বারবার। তবুও বলতে হয়, জীবনে নিজের অশক্ত কাঁধ অনেকেরই অবলম্বন হয়েছিল। কেবলই মনে হয়, এমন একটা কাঁধ যদি পেতাম, যেখানে ভর করে আমার এই লড়াইয়ের ফাঁকে দু'দন্ড জিরিয়ে নিতে পারতাম! অলমতি বিস্তরেন

হিফজুর রহমান, ঢাকা, ৭ জুলাই ২০০৭

ই-মেইলঃ *hifzur@dhaka.net*

বিঃদ্রঃ

এই লেখাটির প্রতিটি শব্দ, বাক্য ও লাইনের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ন লেখকের উপর বর্তায় এবং সে হিসাবে লেখকের কাছ থেকে লিখিত নির্দেশনা নেয়া হয়েছে। উক্ত লেখার কোন শব্দ, বাক্য বা লাইনের জন্যে কর্ণফুলীর কোন সদস্য বা কর্মকর্তা দায়ী নয়। লেখকের আগামী লেখা 'মনুষ্য দর্শন' বিষয়েও একইভাবে কর্ণফুলীর কোন দায়-দায়ীত্ব থাকবেনা।

- - প্রধান সম্পাদক

হিফজুর রহমানের আগের লেখাগুলো দেখতে এই চৌহদ্দিতে টোকা মারুন